ইউনিট
১

মৎস্য চাষ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবহমানকাল থেকেই এদেশের মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আছে মাছ। আর এজন্যই বলা হয় "মাছে ভাতে বাঙালী। বিপুল জলসম্পদের এই দেশে অগনিত মানুষ মৎস্য আহরণ, চাষ ও বেচা-বিক্রিসহ এ সংক্রান্ত নানা কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে প্রাণীজ আমিষের উত্তম উৎস হিসেবে মাছের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বৈদেশিক মুদ্রার্জনের পাশাপাশি মৎস্য চাষ করে অনেক বেকার যুবক-যুবতী স্বাবলম্বী হচ্ছে। যার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সময়োপযোগী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছসহ অন্যান্য জলসম্পদের উৎপাদন বাড়াতে নেওয়া হয়েছে নানা কার্যকর উদ্যোগ। ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যেই শেখ হাসিনা সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর্জন করেছে। এখন জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস.ডি.জি)" অর্জনে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পাশাপাশি সামুদ্রিক বিশাল জলজসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছ চাষের ইতিহাস, মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, মাছের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : মাছ চাষ পদ্ধতির ধারণা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
পাঠ - ১.২ : মাছের আবাসস্থল
পাঠ - ১.৩ : রাজপুটির চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ১.৪ : নাইলোটিকার চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ১.৫ : কই মাছ চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ১.৬ : পাঙ্গাস মাছ চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ১.৭ : ব্যবহারিক : প্রদর্শিত মাছ (রাজপুঁটি, নাইলোটিকা, কই ও পাঙ্গাস) শনাক্তকরণ।

পাঠ-১.১ মৎস্য চাষ ও মাছ চাষ পদ্ধতির ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ চাষের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৎস্য বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- মৎস্য চাষ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাছ চাষের গুরুত্ব অণুধাবন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মাছ, একোয়াকালচার, ব্রুড, হ্যাচারি, আমিষ, কর্মসংস্থান, ব্লু-ইকোনমি, ফিসমিল

মৎস্য চাষ ও মাছ চাষ পদ্ধতির ধারণা

বাংলাদেশে মাছ চাষের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। তবে নাজির আহমেদ (১৯৪৭-১৯৬০) নতুনভাবে এদেশে মাছ চাষের গোড়া পত্তন করেন। স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে প্রচুর মাছ উৎপাদন এবং মাছের ব্যবসা হতে আর্থিক আয়ের বিরাট সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কালক্রমে এ অঞ্চলে পুকুরে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দেশে বর্তমানে মাছের চাষ পদ্ধতিতে বেশ উন্নতি সাধিত হলেও এখনও বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প হিসেবে এটি গড়ে ওঠেনি।

মৎস্য বা মাছ বলতে শীতল রক্ত বিশিষ্ট (ectothermic= cold blooded) জলজ মেরুদন্ডী প্রাণিকে বোঝায় যারা অভ্যন্তরিন ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং জোড় বা বিজোড় পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাচল করে। তবে সব মাছই যে শীতল রক্তবিশিষ্ট এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। কিছু মাছ আছে যেমন-White shark এবং Tuna মাছ তাদের দেহের তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্যের সাথে তাদের দেহের তাপমাত্রার তারতম্য হয় না।

Fish Base এর তথ্য মতে অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত পৃথিবীতে ৩৩,৪০০ প্রজাতির কথা জানা যায়। তবে অনেক প্রজাতি আছে যাদের সম্পর্কে এখনও বর্ণনা করা হয়নি অথবা এখনও অজানা। জানা মাছের প্রজাতির সংখ্যাটি মেরুদন্ডী প্রাণির অন্যান্য সকল শ্রেণীর (স্তন্যপায়ী, উভচর, সরীসৃপ ও পাখী) সম্মিলিত যোগফলের চাইতেও বেশী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন আমরা মাছ বা মৎস্য বলি তখন শুধুমাত্র মাছকেই বোঝানো হয়। আর যখন মাৎস্য বলি তখন মাছের সাথে সাথে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সকল জলজ প্রাণীকে বোঝায়।

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মাছের বিভিন্ন দিক যেমন- শ্রেনীবিন্যাস, মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা, মাছের প্রজনন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন, রোগতত্ত্ব তথা মাছ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে মৎস্যবিজ্ঞান বলে। বর্তমানে মাছ চাষের সাথে অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলজ প্রাণি যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, ব্যাঙ ইত্যাদি চাষ করা হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় মাছ চাষকে বলা হয় একোয়াকালচার (Aquaculture)।

Aquaculture শব্দটি Latin শব্দ `Aqua' যার অর্থ "পানি" এবং English শব্দ 'Culture' যার অর্থ "চাষ" নামক দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ Aquaculture অর্থ পানিতে চাষ অথবা মাছ চাষ। অন্যভাবে, নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলজ জীবের চাষকে একোয়াকালচার বলে। একে Aquafarming ও বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ: মাছ চাষ (Fish farming/culture), চিংড়ি চাষ (Shrimp farming/culture), ওয়েস্টার চাষ (Oyster farming/culture), সীউঈড চাষ (Seaweed farming/culture) ইত্যাদি।

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Fish Culture) :

পরিবেশিক ও প্রাকৃতিক কারণে মৎস্য চাষে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। "মাছে ভাতে বাঙালি"- প্রবাদ বাক্যটি বাংলাদেশের মৎস্য ঐতিহ্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। মাছ এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ

করে। পুষ্টিমান উন্নয়ন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাছ চাষের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

(১) **পুষ্টিমান উন্নয়নঃ** পুষ্টিগত দৃষ্টিকোন থেকে দেহগঠনে আমিষের ভূমিকা ব্যাপক। তুলনামূলক বিচারে প্রাণিজ আমিষ দেহের জন্য ভালো উচ্চ মূল্যের কারণে এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দৈনন্দিন খাবারের সাথে প্রাণিজ আমিষ বিশেষ করে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির মাংসের সংস্থান করতে পারে না। এই শ্রেণির মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে মৎস্য আমিষের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। সস্তায় পওয়া যায় এমন মাছ খেয়ে এদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মিটে। শুধু এরাই নয়, এদেশের প্রায় সব শ্রেনির সব মানুষের কাছেই মাছ সমানভাবে প্রিয়। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষ দৈনিক যে পরিমান প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে তার প্রায় ৬০% ই আসে মাছ এবং চিংড়ি থেকে। গুণগত মানে অন্যান্য আমিষের চেয়ে মৎস্য আমিষ ভালো। পর্যাপ্ত পরিমান মাছ খেলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বাড়ে, রোগের ঝুঁকি কমে এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। মিঠা ও লোনা পানির মাছে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায় যা মানুষের শরীরের জন্য বেশ উপকারি। এছাড়া আয়রণ ও জিংকের ভালো উৎস হলো ছোট মাছ। কাজেই মানুষের দৈনিক খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ খাওয়া উচিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এদেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমান ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(২) **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক হ্যাচারি পরিচালনা, মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ, বিক্রি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের সাথে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রায় ১৫ লক্ষ নারী মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরে বেকার পুরুষ ও নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত হ্যাচারির ব্যবহার আধুনিকায়ন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদা-মাফিক মানসম্পন্ন পোনার উৎপাদন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করত: সম্ভাব্য সকল জলাশয়কে আধুনিক চাষ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত মৎস্য বিপণন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে করে মাছের গুণগত মান ঠিক থাকে এবং মাছ ও মাছজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এসকল ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বেকার নর-নারীদেরকে খাতওয়ারী প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৩) **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ** স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দিনে দিনে এ সেক্টরের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে মৎস্য খাতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ। কাজেই, এখাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

(৪) **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ** বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে অসংখ্য পুকুর ডোবা ছড়িয়ে আছে। এসব পুকুরের সিংহভাগ মাছ চাষের আওতায় আনা হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও পতিত। পতিত বা আপাত মাছ চাষ অযোগ্য এসব পুকুরের মালিকানা দেশের প্রান্তিক চাষী বা বিত্তহীনদের হাতে। সংস্কারের মাধ্যমে এ সমস্ত পুকুরে মাছ চাষ করে বিত্তহীন লোক এবং বেকার যুবকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

(৫) **হাঁস-মুরগির খাদ্যঃ** বাংলাদেশে হাঁস-মুরগির চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে এদের খাদ্যের চাহিদা। মাছের অব্যবহৃত অংশ যেমন-আঁইশ, কাটা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি এবং ফিসমিল (Fishmeal) দ্বারা হাঁস-মুরগির জন্য উত্তম সুষম খাদ্য তৈরী করা সম্ভব। এসব আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য হাঁস-মুরগিকে খাওয়ালে ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৬) **পতিত জমির সদ্ব্যবহারঃ** পতিত/অব্যবহৃত জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করলে পারিবারিক মাছের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে আর্থিকভাবেও কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কাজেই উপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশে মাছ চাষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মাছ চাষের ইতিহাস সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করে ক্লাসে জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

মাছ চাষের সঠিক ইতিহাস অজানা। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি মাছ চাষের গোড়াপত্তনের সাথে জড়িত। বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য হ্যাচারি শুরু হওয়ার পর মাছ চাষ গতি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মাছ চাষ সম্প্রসারিত হয়। বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ ও চিংড়ি। তাছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমাক অনস্বীকার্য। মৎস্য চাষের বহুমাত্রিকীকরণের দরুন মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মানুষের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বিদেশে মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মাছ কিসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়?
(ক) ফুলকার সাহায্যে (খ) পাখনার সাহায্যে
(গ) ত্বকের সাহায্যে (ঘ) চোখের সাহায্যে

২। Aquaculture' অর্থ কি?
(ক) মাছ চাষ (খ) মাছ ধরা
(গ) মাছ রপ্তানি (ঘ) মাছ আমদানি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

মৎস্য চাষী তার পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ শুরু করেছেন। অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মাছকে প্রচুর পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য দিয়েছেন। তারপরেও তিনি মাছের কাংখিত উৎপাদন পাননি এবং তাকে লোকসান গুণতে হয়েছে।

৩। শীতকালে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক সিদ্ধান্ত?
(ক) খাদ্য না দেওয়া (খ) খাদ্য কমিয়ে দেওয়া
(গ) প্রচুর খাদ্য দেওয়া (গ) বার বার খাদ্য দেওয়া

৪। শীতকালে মাছ কম খায় অথবা উপবাস থাকে কেন?
i. শীতল রক্তবিশিষ্ট হওয়ায় মাছ দেহের তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে না বিধায়
ii. শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় তাই খাদ্য কম লাগে।
iii.শীতকালে পানি কমে যায় বিধায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i. ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। ব্লু-ইকোনমি বলেতে নিচের কোনটিকে বোঝানো হয়?
(ক) জলাশয় কেন্দ্রিক অর্থনীতি (খ) পুকুর কেন্দ্রিক অর্থনীতি
(গ) সমুদ্র কেন্দ্রিক অর্থনীতি (ঘ) নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতি।

পাঠ-১.২ মাছের আবাসস্থল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের আবাসস্থল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয়ের ধরণা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মুক্ত জলাশয়, বন্ধ জলাশয়, সুন্দরবন, সমুদ্রসীমা, খাঁড়ি

মাছের আবাসস্থল

মাছের আবাসস্থল হচ্ছে জলাশয়। বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবেই জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের জলাশয়কে নিম্নোক্তভাবে ছক আকারে দেখানো যায়।

সমগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলায়তনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
(১) অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং
(২) সামুদ্রিক জলাশয় বা সমুদ্র।

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) অভ্যন্তরীণ জলাশয়: সমুদ্র ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে যে সকল জলাশয় আছে সেগুলোকেই অভ্যন্তরীণ জলাশয় বলা হয়। একে আবার দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে- (ক) মুক্ত জলাশয় এবং (খ) বদ্ধ জলাশয়। উন্মুক্ত বা মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে পড়েছে নদী-নালা, মোহনা, বিল, কাপ্তাই হ্রদ, সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং প্লাবনভূমি। আর বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে পড়েছে পুকুর, দীঘি, বাঁওড়, উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি খামার ও মৌসুমি জলাশয়। বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৬,৯৯,৪২৭ হেক্টর (প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর)।

(ক) মুক্ত/উন্মুক্ত জলাশয় : বাংলাদেশের মোট মুক্ত জলায়তন ৩৯,১৬,৮২৮ হেক্টর। বিভিন্ন ধরনের মুক্ত জলাশয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:-

(1) নদ-নদী ও মোহনা : নদ-নদী ও মোহনা হলো অনেক মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র এবং আবাসস্থল। নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চল থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত বা আহরিত হয়েছে। আহরিত মাছের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রন থাকে তবে এতে ইলিশের পরিমানই সর্বাধিক। বাংলাদেশে নদ-নদী ও খাঁড়ি অঞ্চলের মোট আয়তন ৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র হলো এদেশের বড় বড় নদী। রুই-জাতীয় মাছ এসব নদ-নদীতে প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে পোনা ছাড়া। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে ইলিশ মাছ এসব নদ-নদীর উজানে ডিম পাড়ার জন্য অভিপ্রায়ন করে থাকে।

(II) সুন্দরবন : বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলা জুড়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বনটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষনা করে। বনটি বাংলাদেশ এবং ভারতে বিস্তার লাভ করেছে তবে বেশিরভাগ অংশই বাংলাদেশের। বনটির ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া অসংখ্য নদীনালা, খাঁড়ি, খাল/বিল মিলিয়ে তৈরি করেছে এক জলাকীর্ণ অঞ্চল যার আয়তন ১,৭৭,৭০০ হেক্টর বা এর কিছু বেশি। সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন- লাক্ষা, ভেটকি, পারশে, দাতিনা, তপসে, মেনো, কই, শিং, মাগুর, টাকি, শোল, ট্যাংরা, পুঁটি, খলসে, চ্যালা, খরশুলা/খল্লা, দাঁড়কিনা, কাইক্কা, ভাঙন, ইলিশ ইত্যাদি ছাড়াও চিংড়ি ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। বনভূমিটি স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

(III) বিল : বিল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জলাশয়। অন্যভাবেও বলা যায়- বিল হলো প্লাবনভূমির গভীরতম অংশ যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলায় বিল রয়েছে। এ ধরনের জলাশয়ের মোট আয়তন

১,১৪,১৬১ হেক্টর। চলনবিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল। বিলে বসবাসকারী মাছের মধ্যে রুই জাতীয় মাছ, আঁইর, বোয়াল এবং অন্যান্য ছোট প্রজাতির মাছ উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে নদীতে বন্যা হয়, তখন নদী আর বিল মিশে একাকার হয়ে যায়। এসময় নদী থেকে অনেক মাছ বিলে বিচরণ করে, বিলের ইকোসিস্টেমের পর্যাপ্ত খাদ্য খেয়ে দ্রুত বড় হয় এবং বাচ্চা দেয়। বন্যার পানি নেমে গেলে অনেক মাছ বিলে আটকা পড়ে এবং সেখানেই বড় হতে থাকে। এভাবেই বিল হয়ে ওঠে মাছের আবাসস্থল।

(IV) কাপ্তাই হ্রদ : এটি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট অর্থাৎ মানব সৃষ্ট হ্রদ এবং বাংলাদেশের বৃহৎ হ্রদ। ১৯৫৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে কাপ্তাই শহরের নিকট "কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হলে রাঙামাটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে ডুবে যায় এবং এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। মিঠা পানির বিভিন্ন মাছ যেমন-রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, গণিয়া, গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প, আঁইর, বোয়াল, চিতল, ফলি, পাংগাস, স্বরপুঁটি, শিং, মাগুর, টেংরা, শোল, গজার, টাকি, পাবদা, বাইম, পুঁটি, চাপিলা, তেলাপিয়া, কাচ্‌কি ইত্যাদি মাছের উল্লেখযোগ্য ভান্ডার হলো এ হ্রদ। হ্রদটির আয়তন ৬৮,০০০ হেক্টর।

(V) প্লাবন ভূমি : বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা ও বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়। প্লাবন ভূমিতে ৩-৬ মাস পানি আটকা থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় মাছ এসব প্লাবনভূমিতে বিচরণ করে, বংশ বিস্তার করে এবং মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রতি বছর প্রায় ২৭,০২,৩০৪ হেক্টর জমি বন্যা ও বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়।

(খ) বদ্ধ জলাশয় : বাংলাদেশে মোট বদ্ধ জলায়তন ৭,৮২,৫৯৯ হেক্টর। বিভিন্ন ধরনের বদ্ধ জলাশয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(I) পুকুর : পুকুর হলো স্থির পানির ক্ষুদ্র জলাশয় যার চতুর্দিকে উঁচু পাড় থাকে। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে পুকুর খনন করা হতো বিশেষত: দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটানো এবং গোসল করার জন্য। বর্তমানে দেশে ছোট, বড় মাঝারি, মৌসুমি সব ধরনের পুকুরেই মাছ চাষ করা হয়। আমাদের দেশে ১৩ লক্ষাধিক পুকুর-দীঘি রয়েছে যার যার মোট আয়তন ৩,৭১,৩০৯ হেক্টর।

(II) বাঁওড় : নদীর বাঁকে U আকৃতির জলাশয় যা নদীর মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাকেই বাঁওড় বলা হয়। দেশের অধিকাংশ বাঁওড়ই বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুরে অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁওড়েই রুই জাতীয় মাছের পোনা ছেড়ে চাষ করা হয়। বাঁওড়ের মোট জলাশয়তন ৫,৪৮৮ হেক্টর।

(III) উপকূলীয় চিংড়ি খামার : সমুদ্রের নিকটবর্তী যে সব অঞ্চলে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে সেখানে এ খামারগুলো অবস্থিত। উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের জমিতে জোয়ারের পানি আটকিয়ে রেখে সেখানে চিংড়ি চাষ করা হয়। এসব জলাশয় চিংড়ি ঘের নামে পারিচিত। এসব ঘেরে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি মোহনা দিয়ে জমির কিছুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। এসব জলাশয়কে খাঁড়ি বলে। খাঁড়ি অঞ্চলের মাছগুলো হলো ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি ইত্যাদি। উপকূলীয় চিংড়ি খামারের মোট আয়তন ২,৭৫,২৭৪ হেক্টরের কিছু বেশী।

(IV) মৌসুমি জলাশয় : এ ধরনের জলাশয়ে শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুমে অল্প দিনের জন্য পানি থাকে। ধানক্ষেত, পাগার ইত্যাদি মৌসুমি জলাশয়ের শ্রেণীভূক্ত। মৌসুমি জলাশয়ের মোট আয়তন ১,৩০,৪৮৮ হেক্টর। এ ধরনের জলাশয় সাধারণত ছোট মাছ পাওয়া যায়।

(২) সামুদ্রিক জলাশয়: বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক এলাকা যেখানে ৭১০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ উপকূল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত রয়েছে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাস করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি। সামুদ্রিক এলাকার মাছ চাষ করা হয় না। শুধুমাত্র সমুদ্র থেকে মাছ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাণী আহরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সামুদ্রিক জলাশয় থেকে ৬,২৬,৫২৮ মেট্রিক টন মৎস্য আহরিত হয়েছে। পৃথিবীর ভূখন্ডগত সম্পদ কমার সাথে সাথে মানুষ এখন সমুদ্র মুখী হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন সমুদ্রের ওপর তার অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ যথাক্রমে জার্মানির হামবূর্গ এ অবস্থিত ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea)-এর মাধ্যমে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং নেদারল্যান্ডের হেগের "স্থায়ী সালিসি আদালত (The Permanent Court of Arbitration at the

Hague) এর মাধ্যমে ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করে যথাক্রমে ১,১১,৬৩১ এবং ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার নতুন সমুদ্র এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে এই বিশাল সমুদ্র এলাকার সকল প্রকার প্রাণিজ (মাছসহ অন্যান্য প্রাণি) এবং অ-প্রাণিজ (তেল, গ্যাস ইত্যাদি) সম্পদ উত্তোলন, আহরণ এবং ব্যবহারের অধিকার পায় বাংলাদেশ। এখানে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা থাকা দরকার। তা হলো-বিরোধ নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ খাতা-কলমে তটরেখা (Baseline) থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা দাবী করলেও বাস্তবে ১৩০ নটিক্যাল মাইলের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। এখন বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে পুরোপুরি ২০০ নটিক্যাল মাইলের ওপর বাংলাদেশের অধিকার সংরক্ষিত হলো। শুধু তাই নয়, এ রায়ের ফলে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরেও মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করে শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

মাছের আবাসস্থল হল পানি। বাংলাদেশ হল পানির দেশ। আর তাই এদেশের মানুষের কাছে মাছ সহজপ্রাপ্য। ছোট বড় নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, পুকুর-ডোবায় ভর্তি আমাদের দেশ। দক্ষিণে রয়েছে বিশাল এক সামুদ্রিক অঞ্চল যার নাম বঙ্গোপসাগর। এসব জলাশয়ে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক ভাবেই পাওয়া যায়। সাদা সোন খ্যাত চিংড়ি মাছ চাষ করা হয়। উপকুলীয় অঞ্চলের ঘের গুলোতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি মুক্ত জলাশয়?
(ক) পুকুর (খ) দীঘি
(গ) ডোবা (ঘ) কাপ্তাই হ্রদ

২। নিচের কোনটি বদ্ধ জলাশয়?
(ক) নদী (খ) হ্রদ
(গ) বাঁওড় (ঘ) বিল

৩। কোন কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা রয়েছে?
(ক) ভারত ও নেপাল (খ) ভারতও মিয়ানমার
(গ) মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড (ঘ) ভারত ও পাকিস্তান

পাঠ-১.৩ রাজপুঁটির চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাঁজপুটি মাছের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- রাঁজপুটি মাছের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- রাঁজপুটি মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রাজপুঁটি মাছ পরিচিতি:

রাজপুঁটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল মিঠাপানির চাষোপযোগী মাছ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে (যেমন- থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) এ মাছ চাষ করা হয়। মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Barbonymus gonionotus*. মাছটির আগের নাম ছিল *Puntius gonionotus* যা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড থেকে মাছটিকে প্রথম আমাদের দেশে আনা হয়। মাছটি দেখতে অনেকটা দেশী সরপুঁটি মাছের মত। তবে দেশী সরপুঁটির তুলনায় এদের দেহ বেশ চেপ্টা ও পাতলা। মাছটিকে অনেকে থাই সরপুঁটিও বলে থাকে। মাছটির পিঠের উপরের দিক হালকা মেটে, শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল রূপালি, লেজ খাঁজ কাটা, পেটের পাখনার রং হালকা হলুদাভ। পোনা অবস্থায় এরা ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন খায়। পরিণত বয়সে এরা বিভিন্ন ধরণের জলজ উদ্ভিদ/আগাছা, ক্ষুদিপানা এবং ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণিও খেয়ে থাকে। চাষের অবস্থায় এরা চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল ইত্যাদি খেয়ে থাকে। রাজপুঁটি প্রায় এক বছরেই প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এরা নদী বা খালের স্রোতশীল পানিতে প্রজনন করে থাকে।

চিত্র ১.৩.১: রাজপুঁটি মাছ

রাজপুঁটি মাছের বৈশিষ্ট্য/চাষের সুবিধা

(১) উচ্চ ফলনশীল এবং সুস্বাদু মাছ।
(২) প্রায় সব ধরনের খাদ্যই খায়। তবে ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ এদের প্রিয় খাদ্য।
(৩) যে কোনো প্রকার পুকুর, ডোবা বা পতিত জলাশয়ে চাষযোগ্য।
(৪) রুইজাতীয় মাছের সাথে মিশ্র চাষ সম্ভব।
(৫) অল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে সহজেই মাছটি চাষ করা সম্ভব।
(৬) দ্রুত বর্ধনশীল এ মাছ ৪-৬ মাসের মধ্যে আহরণযোগ্য।
(৭) খাদ্যের জন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হয় না।
(৮) সহজ চাষ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ঘোলা পানিতে ও ধান ক্ষেতে সমন্বিতভাবে চাষ করা সম্ভব।

রাজপুঁটি মাছের একক চাষ পদ্ধতি

রাজপুঁটি চাষ করতে হলে নিম্নোক্ত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করা প্রয়োজন।

১। মজুদ পকুর ব্যবস্থাপনা:

পুকুর প্রস্তুতি: পুকুর প্রস্তুতির উপর মাছ চাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সে কারণে পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই পুকুর ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সাধারণত: ১০-৩০ শতাংশ আয়তনের যে কোনো মৌসুমী পুকুর যেখানে পানির গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার থাকে এমন পুকুর রাজপুঁটি চাষের জন্য উপযোগী। পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো হলো:

(ক) পাড় ও তলা ঠিক করা: পুকুরের পাড় ভালোভাবে মেরামত করতে হবে যাতে বন্যার পানি বা বৃষ্টির পানি পুকুরে ঢুকতে না পারে। জাল টানার সুবিধার্থে পুকুরের তলা সমান করতে হবে। তলায় জমা অতিরিক্ত পচা কাদা অপসরণ করতে হবে নতুবা পানিতে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হবে। পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা থাকলে ডালপালা ছেটে দিতে হবে নতুবা গাছের পাতা পানিতে পড়ে পচে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট করবে।

(খ) ক্ষতিকর আগাছা দমনঃ জলজ আগাছা হিসেবে পুকুরে কচুরীপানা, টোপাপানা ও তন্তুজাতীয় শেওলা দেখা যায়। মাছের পোনা মজুদের পূর্বে এই সমস্ত জলজ আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। শিকড়যুক্ত আগাছা থাকলে শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। পুকুরে আগাছা থাকলে মাছ চাষে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। যেমন-

- পুকুরে সূর্যালোক পৌঁছাতে বাঁধা দেয়
- রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাসস্থান হিসেবে কাজ করে
- মাছের চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়
- রাত্রে এবং মেঘলা দিনে পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটায়
- পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটায়।

(গ) রাক্ষুসে মাছ অপসরণঃ পুকুরের রাক্ষুসে মাছ দু'ভাবে অপসারণ করা যায়।
জাল টেনে বা পুকুরে শুকিয়ে
মাছের পোনা মজুদ করার পূর্বে ঘন ঘন জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, টাকি, চিতল, বোয়ল ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। যদি জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ অপসারণ করা না যায় তবে পুকুর শুকিয়ে ফেলে কাজটি করা যেতে পারে।

ওষুধ প্রয়োগ করে
রোটেনন- প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ৩০ গ্রাম/শতাংশ হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে রোটেনন প্রয়োগ করে পানি ওলটপালট করে দিলে তাড়াতাড়ি কাজ করে।

ফসটক্সিন ট্যাবলেট ১ মিটার পানির গভীরতার জন্য ৩টি ট্যাবলেট/শতাংশ হারে ব্যবহার করা যাবে। সমস্ত পুকুরে ট্যাবলেট সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পানি ওলটপালট করে দিতে হবে। ১-২ ঘন্টা পর মাছ ভাসতে শুরু করলে তুলে ফেলতে হবে।
(বি:দ্রঃ পুকুরে ফসটক্সিন ব্যবহার করা অনেক সময় অনুমোদন করা হয় না। কারণ, ফসটক্সিন থেকে উৎপন্ন গ্যাস মানুষও গবাদি পশুর জন্য খুবই ক্ষতিকর।)

(ঘ) চুন ও সার প্রয়োগঃ পুকুরের ঘোলা ও বিষাক্ত পানি শোধন ও প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে চুন ও সার প্রয়োগ করতে হয়। রাক্ষুসে মাছ অপসারনের ১-২ দিন পর ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন পানিতে গুলে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। চুন ক্ষতিকর রোগ জীবাণু ধ্বংস করে, মাটি ও পানির গুণাগুণ ঠিক রাখে, মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৩-৪ কেজি/শতাংশ হারে গোবর (জৈব সার) অথবা ২ কেজি/শতাংশ হারে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে। এর ৬-৭ দিন পর অজৈব সার হিসেবে ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া/শতাংশ এবং ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি/শতাংশ হারে প্রয়োগ করতে হবে। অজৈব সার পানিতে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পানির রং সুবজাভ হলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে। তখন মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

২। মাছের পোনা মজুদ

- নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা নির্ভরযোগ্য বেসরকারি খামার থেকে প্রয়োজন অনুসারে রাজপুঁটি মাছের পোনা সংগ্রহ করতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে ১/৩ ভাগ পানির সাথে ২/৩ ভাগ অক্সিজেন সহকারে পোনা সংগ্রহ করা উত্তম। পোনা পরিবহনের কাজটি সকালে করা শ্রেয়।
- সংগৃহিত পোনা (৫-৭ সে.মি আকারের) ৭০-৮০টি/শতাংশ হারে মজুদ করা যেতে পারে। সকাল বেলা পোনা মজুদ করার উত্তম সময় কারণ এসময় তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে তাপমাত্রাজনিত কারণে পোনা মৃত্যুর হার কম হয়।
- সংগৃহিত পোনা সরাসরি মজুদ করা যাবে না। প্রথমে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা মজুদ পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতায় আনতে হবে। এজন্য পোনা ভর্তি ব্যাগ কিছুক্ষণ পুকুরের পানিতে রাখতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে কাত করলে ব্যাগের পানি পুকুরে এবং পুকুরের পানি ব্যাগে যাবে। এভাবে রাখলে পোনাও আস্তে আস্তে পুকুরে চলে যাবে।

৩। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

- পোনা মজুদের পরের দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হারে চাউলের কুঁড়া (৮০%) ও সরিষার খৈল (২০%) এর মিশ্রণ খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। নিচের সারণি অনুসরণ করেও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারণি ১। প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার পর থেকে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের পরিমান।

মাস	প্রতিদিনের খাদ্য (গ্রাম)
১	৪০
২	৯০
৩	১৭০
৪	২১৫
৫	২৫০
৬	৩০০

* সকালে ও বিকালে প্রতিদিন দু'বার নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার দিতে হবে।
* সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর পুকুরে ৪-৬ কেজি/শতাংশ হারে গোবর ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষণ

প্রতি মাসে অন্তত একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। মাছের নমুনা সংগ্রহ করে ওজন পরীক্ষা করতে হবে। যদি রং উজ্জ্বল হয়, গায়ে পিচ্ছিল স্বচ্ছ পাদার্থ থাকে, কোনো ক্ষত চিহ্ন না থাকে, পাখনাগুলো ভালো থাকে এবং দেখতে বেশ তাজা মনে হয় তবে বুঝতে হবে মাছের স্বাস্থ্য ভালো আছে। রাজপুঁটি মাছ বেশ শক্ত প্রকৃতির হওয়ায় রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে শীতকালে কখনও কখনও ক্ষত রোগ হতে পারে। শীতের শুরুতে ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করে পানি শোধন করলে রোগ বালাই থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। রাজপুঁটি আহরণ ও উৎপাদন/আয়

- উল্লেখিত পদ্ধতিতে ৫-৬ মাস চাষ করার পর মাছের ওজন ১৫০-১৭০ গ্রাম হয়ে থাকে। এমন ওজনের মাছ বিক্রির জন্য ধরা যেতে পারে।
- পুকুর থেকে খুব সকালে মাছ ধরতে হবে, যাতে জীবিত বা তাজা অবস্থায় বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
- পুকুর না শুকিয়ে বেড় জাল টেনে সমস্ত মাছ আহরণ করা যায়।
- আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে রাজপুঁটি মাছ চাষ করে ৫-৬ মাসে প্রতি শতাংশে ১০ থেকে ১২ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব। একক চাষ পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রতি শতাংশ হতে ৬ মাসে ৫০০-৬০০ টাকা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

৬। রাজপুঁটির রোগ ব্যবস্থাপনা

সাধারণত: শীতকালে মাছ কম খায় ফলে শারীরিকভাবে কিছুটা দূর্বল থাকে। রাজপুঁটি মাছও এর ব্যতিক্রম নয়। আর ঐ সময়টাই সুযোগ সন্ধানী রোগ জীবাণুর জন্য আদর্শ। তাই শীতকালে মাছ রোগক্রান্ত হতে পারে। রাজপুঁটি মাছের ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, আঁইশ খসে পড়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে। রাঁজপুঁটি মাছের রোগ ব্যবস্থাপনার করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ মাছ চাষের উপযোগী রাখতে হবে।
(২) পুকুরে গুণগতমানসম্পন্ন ভাল জাতের পোনা মজুদ করতে হবে।
(৩) পুকুরটি হতে হবে খোলামেলা ও আগাছা মুক্ত।

(৪) পুকুরে যাতে কোনো অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর প্রাণি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
(৫) পুকুরটি বন্যামুক্ত স্থানে হওয়া বাঞ্চনীয়।
(৬) মাত্রাতিরিক্ত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৭) পানির গুণাগুণ মাছ চাষের উপযোগী রাখার জন্য নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।
(৮) শীত মৌসুমের পূর্বেই মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
(৯) নমুনায়নের সময় আক্রান্ত মাছ পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(১০) আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত উপকরণ (জাল) অন্য পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না। কড়া রৌদ্রে শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা যেতে পারে।
(১১) পুকুরে মাছের ক্ষতরোগ দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হবে।
(১২) মজুদ মাছের সংখ্যা ও পুকুরের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা যাবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা রাজপুঁটি মাছ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করবে এবং এর ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

এক প্রজাতির মাছের চাষকে একক এবং একাধিক প্রজাতির মাছের চাষকে মিশ্র চাষ বলা হয়। রাজপুটির একক চাষ সহজ ও লাভজনক। প্রতি শতাংশের পুকুরের রাজপুটির ৭৮-৯০ টি পোনা ছেড়ে সার ও সম্পুরক খাদ্য ব্যাবহার করতে হবে। ৪-৬ মাসের ভিতর মাছ বাজারে বিক্রির আকার ধারণ করবে। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে রাজপুটি মাছ চাষ করে ৫-৬ মাসে প্রতি শতাংশ হতে ১০ থেকে ১২ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাজপুঁটি মাছটি প্রথম কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
(ক) ভারত (খ) মিয়ানমার
(গ) থাইল্যান্ড (ঘ) চীন

২। রাজপুঁটির বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?
(ক) *Barbonymus gonionotus* (খ) *Labeo Gonius*
(গ) *Labeo bata* (ঘ) *Puntius sarana*

৩। রাজপুঁটির পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য কী?
(ক) খৈল ও কুঁড়া (খ) ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন
(গ) ছোট মাছ (ঘ) ডিমের কুসুম

পাঠ-১.৪ নাইলোটিকার চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাইলোটিকা মাছের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- নাইলোটিকা মাছের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নাইলোটিকা মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হবেন।

	মুখ্য শব্দ	নাইলোটিকা, পুকুর, ফসটক্সিন, রোটেনন, পি.এইচ.এ

নাইলোটিকা মাছ পরিচিতিঃ

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ছিল নীল তেলাপিয়া মাছের আদি নিবাস। সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই এ মাছ পাওয়া যায়। মাছটি চাষের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড হতে আমাদের দেশে প্রথম আমদানি করা হয়। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে মাছটিকে নাইলোটিকা নামে ডাকা হয়। এটি আসলে নীল তেলাপিয়া এবং এই নামেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত যদিও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম হল: *Oreochromis niloticus*. এটি একটি শক্ত প্রকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। নদী, হ্রদ, পয়ঃনিষ্কাশন নালা, সেচ নালাসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাদুপানির জলাশয়ে মাছটি স্বাচ্ছন্দে বাড়তে পারে। মাছটি প্রায় সব ধরনের খাদ্য খায়। কিশোর অবস্থায় এরা সর্বভূক; ফাইটোপ্ল্যাংকটন, জুপ্ল্যাংকটন ও পঁচনশীল জৈব পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এরা ফাইটোপ্ল্যাংকটন এবং জুপ্ল্যাংকটন প্রধান খাদ্য হিসেবে খেয়ে থাকে। সম্পূরক খাদ্য দিয়েও মাছটি চাষ করা যায়। মাছটি ৮-৪২^{o}C তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। নাইলোটিকা মাছ তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ৩-৬ মাসে প্রজননক্ষম হয় বাচ্চা ফোটায় এবং কুসুমথলি মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলো এরা মুখেই রাখে। উল্লেখ্য, স্ত্রী মাছ ২০০টি পর্যন্ত ডিম মুখে রাখতে পারে। মাছটি দেখতে ধূসর নীলাভ থেকে সাদা লালচে। পুরুষ মাছের গলার অংশের বর্ণ লালচে এবং স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে বর্ণ লালচে হলুদাভ। পৃষ্ঠ পাখনা কৃষ্ণবর্ণের মার্জিনযুক্ত এবং পুচ্ছ পাখনা সাদা বর্ণের সরু ও লম্বা দাগযুক্ত।

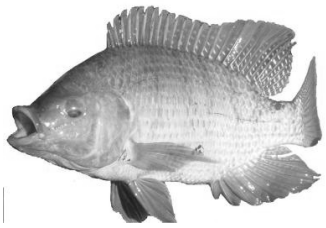

চিত্র ১.৪.১ : নাইলোটিকা মাছ

নাইলোটিকা মাছের বৈশিষ্ট্য/চাষের সুবিধাঃ

(১) নাইলোটিকা মাছ বেশ শক্ত গড়নের হওয়ায় রোগবালাই তেমন হয় না।
(২) মাছটি সুস্বাদু এবং দেখতে আকর্ষনীয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
(৩) অধিক ফলনশীল হওয়ায় মাছটি চাষে অধিক লাভ হয়।
(৪) সর্বভূক বিধায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ অনেক কম।
(৫) প্রকৃতির বিরূপ পরিবেশে (যেমন- কম অক্সিজেন, বিরূপ তাপমাত্রা) সহনীয় ক্ষমতা বেশি।
(৬) জৈবিক ও কৃষিজ বর্জ্যকে উন্নত আমিষে রূপান্তরকরণে সক্ষম।
(৭) এ মাছের পোনা সহজেই পাওয়া যায়।
(৮) বেশি ঘনত্বে চাষাবাদ করা যায়।
(৯) স্বাদু ও লবণাক্ত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ে চাষাবাদ করা যায়।
(১০) বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়। যেমন-একক, মিশ্র, সমন্বিত, খাঁচায় ও পেন পদ্ধতি ইত্যাদি।

নাইলোটিকা মাছের একক চাষ পদ্ধতিঃ

নাইলোটিকা মাছ চাষ করতে হলে নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১। মজুদ পুকুর ব্যবস্থাপনাঃ

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : বছরে ৬ মাস পানি থাকে এমন যে কোনো জলাশয়ে সফলভাবে নাইলোটিকা চাষ করা যায়। পুকুরের পানির গভীরতা ১.৫ মিটার থাকলে ভাল হয়। উল্লেখ্য, ৫ শতাংশ বা তার নিচের আকারের জলাশয়েও নাইলোটিকা মাছ চাষ করা যায়। নির্বাচিত পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তলায় ৩০ সে.মি. এর বেশি কাদা থাকলে তা অপসরণ করতে হবে এবং তলা সমান করতে হবে যাতে জাল টানতে সুবিধা হয়। তাছাড়া তলার পঁচা কাদা অপসারণ করলে পানিতে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয় না। পুকুরে ভাসমান অথবা শিকড়যুক্ত সব ধরনের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

রাক্ষুসে মাছ দমন : টাকি, শোল, বোয়াল, চিতল, গজার প্রভৃতি হলো রাক্ষুসে মাছ। এরা চাষকৃত মাছের পোনা ও ডিম খেয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। তাই পুকুরে পোনা মজুদের আগে এসব রাক্ষুসে মাছ দমন করতে হবে। দুইভাবে কাজটি করা যেতে পারে। জাল টেনে অথবা ঔষধ প্রয়োগ করে। পুকুরে ঘন ঘন জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন করা যেতে পারে। সম্পূর্ণভাবে দমন করা না গেলে পুকুর শুকিয়ে নেওয়া উত্তম। তবে ঔষধ প্রয়োগ করে কাজটি সহজেই করা যায়। এক্ষেত্রে ফসটক্সিন ও রোটেনন ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুন ও সার প্রয়োগঃ চুনের বাফার হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা আছে। পানির p^H পরীক্ষা করে চুন ($CaCo_3$) প্রয়োগ করা উচিত। উল্লেখ্য, কিছুটা ক্ষারীয় p^H মাছ চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে অধিকাংশ পুকুরের পানির p^H ৯ থেকে ৯.৫ এর ভিতরে থাকায় তা মাছ চাষের জন্য বেশ সহায়ক। তবে p^H এর মাত্রা কোনো কারণে অম্লীয় হলে চুন ব্যবহার করতে হবে। চুন প্রয়োগ করলে পানি পরিষ্কার হয় এবং রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়। পুকুরে চুন দিলে সার তাড়াতাড়ি কাজ করে চুনের ডোজ শতাংশে ১ কেজি। বাজারে সচরাচর প্রাপ্ত পাথুরে চুন ($CaCo_3$) ব্যবহার করা হয়। চুন প্রয়োগের ৩ থেকে ৪ দিন পর শতাংশে ৩-৪ কেজি গোবর + ২ কেজি মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে। এর এক সপ্তাহ পর শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া+ ৫০ গ্রাম TSP পানিতে গুলে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত ইউরিয়ার অর্ধেক পরিমাণে TSP সার দিতে হয়। সার প্রয়োগের ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে পানির রং সবুজাভ হলে পোনা ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

২। পোনা সংগ্রহ ও মজুদকরণ :

নির্ভরযোগ্য কোনো হ্যাচারি থেকে একটু বড় আকারের (৫-৭ সে.মি.) পোনা সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য, বড় আকারের পোনার মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন দিয়ে পোনা সংগ্রহ করতে হবে যাতে করে পোনার ওপর পরিবহনজনিত চাপ (stress) না পড়ে। সংগৃহিত পোনা প্রতি শতাংশে ৬০ থেকে ৮০ টি করে মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করে নিতে হবে। পোনা মজুদের কাজটি সকালে করা ভাল। সকালের দিকে তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার উপর তাপমাত্রাজনিত বিরূপ প্রভাব পড়ে না।

৩। মজুদ পরবর্তি ব্যবস্থাপনা :

(ক) পোনার পরিচর্যা : নাইলোটিকা মাছ পুকুরের সব স্তরে বাস করে এবং সব ধরনের খাদ্য খায়। মজুদ মাছের মোট দৈহিক ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হারে চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি ও সরিষার খৈলের মিশ্রণ সকাল ও বিকালে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার খৈল পুকুরে প্রয়োগ করার অন্তত: ১২ ঘন্টা পূর্বে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে পোনা ছাড়ার ৮ থেকে ১০ দিন পর থেকে সব ধরনের খাবার পুকুরে দেওয়া যায়। বাজার থেকে কেনা পিলেট খাবারও ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রে মাছ চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। খাদ্য হিসেবে রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টও দেওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মাছের গড় ওজনের সাথে মিলিয়ে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) অতিরিক্ত পোনা সরানো : নাইলোটিকা মাছ পুকুরের বদ্ধ পানিতে বাচ্চা দেয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে বছরে একাধিক বার বাচ্চা দেয়। সঙ্গত কারণেই পুকুর অতিরিক্ত পোনায় ভরে যায়। এর ফলে অধিক ঘনত্বে মাছ আশানুরূপ বড় হতে পারে না এবং খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তাই জাল টেনে পোনার ঘনত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে।

(গ) অন্যান্য পরিচর্যা : নাইলোটিকা মাছ খাবার ঠিকমত খাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি দেখা যায় সকালের দিকে মাছ পানির ওপরে হা করে শ্বাস নিচ্ছে তখন বুঝতে হবে পানিতে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় পুকুরে খাবার ও সার দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। এ সময় লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করে, ঘনঘন জাল টেনে অথবা পুকুরে নেমে সাঁতার কেটে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। এ্যারেটর ব্যবহার করেও কাজটি করা যেতে পারে।

(ঘ) মাছ আহরন ও বাজারজাতকরণ : নাইলোটিকা মাছ ৫ থেকে ৬ মাসে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের হয়ে যায়। এমন ওজনের মাছ টানা বেড় জাল দিয়ে বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে। আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বড় মাছ গুলো ধরে জীবিত অবস্থায় বাজারে নিলে ভাল দাম পাওয়া যাবে।
একবারের চাষে নাইলোটিকা মাছের উৎপাদন দাঁড়ায় বিঘা প্রতি ২৫০-৩০০ কেজি। তবে ব্যবস্থাপনা উন্নত করে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

নাইলোটিকা মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা :
নাইলোটিকা মাছ অত্যন্ত শক্ত গড়নের হওয়ায় এর রোগবালাই তেমন একটা দেখা যায় না। তবে প্রতিকূল পরিবেশে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। শীতের শুরুতে নাইলোটিকা মাছ লেজ ও পাখনা পঁচা, আঁইস খসে পড়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। তাই শীত শুরুর আগে শতাংশে ১ কেজি চুন পানিতে গুলে পুকুরে দিলে উপকার পাওয়া যায়। শীত মৌসুমের আগেই মাছ আহরণ করে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য ব্যবস্থাপনা রাজপুঁটি মাছের অনুরূপ।

শিক্ষার্থীর কাজ	**শিক্ষার্থী নাইলোটিকা চাষ পদ্ধতির উপর প্রতিবেদন দিবে।**

সারসংক্ষেপ

নাইলোটিকা একটি শক্ত প্রকৃতির দ্রুত বর্ধণশীল মাছ। স্ত্রী মাছ কুসুমথলি মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাচ্চা মুখে রাখতে পারে। বছরে ৬ মাস পানি থাকে এমন জলাশয়ে নাইলোটিকা চাষ করা হযে থাকে। নাইলোটিকা মাছ পুকুরের সব স্তরে বাস করে এবং সব ধরণের খাদ্য খায়। নাইলোটিকা মাছ ৫ থেকে ৬ মাসে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের হলে বাজার জাত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নাইলোটিকার আদি নিবাস কোথায়?
(ক) আফ্রিকা (খ) ইউরোপ
(গ) অস্ট্রেলিয়া (ঘ) ভারতীয় উপমহাদেশ

২। নাইলোটিকা চাষে পুকুরে কী হারে চুন দেওয়া হয়?
(ক) শহাংশে ৫ কেজি (খ) শতাংশে ৩ কেজি
(গ) শতাংশে ২ কেজি (ঘ) শতাংশে ১ কেজি

৩। নাইলোটিকা মাছ বছরে কয়বার বাচ্চা দেয়?
(ক) একবার (খ) দুইবার
(গ) একাধিক বার (ঘ) বাচ্চা দেয় না

পাঠ-১.৫ কই মাছের চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কই মাছের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- কই মাছের চাষ পদ্ধতি এবং চাষের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কই মাছের রোগ এবং রোগের প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জিয়ল, থাই কই, জুপ্লাংকটন, পুকুর

কই মাছের একক চাষ পদ্ধতিঃ

কই মাছ বাংলাদেশের মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি ছোট মাছ। এটি খেতেও যেমন সুস্বাদু, পুষ্টিগুণেও তেমন ভরপুর। মাছটি পানির উপরে দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে বলে একে জিয়ল মাছ বলা হয়। এক সময় প্রাকৃতিক ভাবেই এদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে কই মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট কারণে এ মাছটি আজ বিলুপ্তির পথে। স্বাদ, পুষ্টিগুণ, উচ্চ বাজারমূল্য ও সর্বোপরি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে এ মাছকে অবশ্যই গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। তাছাড়া চাষ পদ্ধতিতে মাছটি অন্তর্ভূক্ত করে উৎপাদন বাড়ানো এখন সময়ের দাবী। তবে পোনার অপ্রতুলতার কারণে কই মাছের চাষ আশানুরূপভাবে প্রসার লাভ করেনি। দেশীয় কই মাছের কৃত্রিম প্রজননের চেষ্টা সফল হলেও নিম্ন বর্ধন হারের কারণে মাছটির বাণিজ্যিক চাষের আশা অনেকটা মিইয়ে যায় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ২০০২ সালে বেসরকারি পর্যায়ে দেশীয় কই মাছের অনুরূপ একটি বর্ধনশীল জাত থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয় যা 'থাই কই' নামে পরিচিত। এদেশের আবহাওয়ায় সহজে মানিয়ে নেওয়ায় বর্তমানে স্থানীয়ভাবেই এ মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলভাবে করা হচ্ছে। আমাদানিকৃত থাই কই এর উৎপাদন দেশী কই অপেক্ষা ৫০% বেশি হওয়ায় বাণিজ্যিক চাষে অধিক মুনাফা করা সম্ভব। পরবর্তিতে ২০১১ সালে আরো একটি কই এর জাত ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করা হয় যা থাই কই এর চেয়েও বেশি বর্ধনশীল। ভিয়েতনামী কই ইতোমধ্যেই দেশব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং অনেক চাষীই মাছটি চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

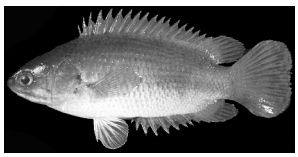

চিত্র ১.৫.১: কই মাছ

কই মাছ চাষের সুবিধা :

(১) যে কোন ধরনের জলাশয় এমনকি চৌবাচ্চা বা খাঁচাতেও চাষ করা যায়।
(২) অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।
(৩) একক এবং মিশ্র চাষের জন্য উপযোগী।
(৪) টেকসই মাছ হওয়ায় বিরূপ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে।
(৫) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা সম্ভব, তাই চাষের জন্য সহজেই পোনা পাওয়া যায়।
(৬) প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে।
(৭) কম সময়ে (৩-৪ মাস) বাজারজাত করা যায়, ফলে দ্রুত পুঁজি ফেরত পাওয়া যায়।
(৮) অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় কই মাছ পানি ছাড়াও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে, ফলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করে বেশি দাম পাওয়া যায়।
(৯) রোগীর পথ্য হিসেবে এবং সুস্বাদু হওয়াতে কই মাছের বাজার চাহিদা ব্যাপক।

কই মাছের একক চাষ পদ্ধতি :

কই মাছ চাষ করার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে।

পুকুর নির্বাচন :

৪-৬ মাস পানি থাকে এ রকম যে কোন পুকুর কই চাষের জন্য উপযোগী। পুকুরের আয়তন ১৫-৫০ শতাংশ হলে ভালো হয়। নিচের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুকুর নির্বাচন করা উচিত:

- মজুদ পুকুর আকৃতিতে আয়তকার হবে।
- পুকুরের মাটি দো-আঁশ হবে।
- পুকুরের তলায় ১৫ সে.মি. এর অধিক কাদা থাকবে না।
- বন্যামুক্ত স্থানে পুকুর নির্বাচন করতে হবে।
- পুকুরের স্থানটি আলো-বাতাস পূর্ণ হবে।

পুকুর প্রস্তুতকরণ : পুকুর প্রস্তুত ভালোভাবে না হলে মাছ চাষ চলাকালীন নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তাই নির্বাচিত পুকুর কই মাছ চাষের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। পুকুর প্রস্তুতকরণের ধাপগুলো নিম্নরূপ-

অবাঞ্চিত প্রাণী ও আগাছা দমন

পুকুরের পানিতে আগে থেকেই বসবাসকারী রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ ও প্রাণি দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ রোটেনন, ফসটক্সিন ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায় যা ব্যবহার করে উক্ত কাজটি করা যেতে পারে। তবে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এসব দ্রব্য যতটা সম্ভব না ব্যবহার করাই ভাল। সেক্ষেত্রে ছোট/চিকন মেসের জাল বার বার টেনে রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণি দূর করা যায়। পুকুর সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে কাজটি করলে সবচেয়ে ভাল হয়। এসময় আগাছাও পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

তলা ও পাড় মেরামত

পুকুরের তলার অতিরিক্ত পঁচা কালো কাদা অপসারণ করে পুকুরের পাড়ের গর্ত খানাখন্দ মেরামত করতে হবে। তলা সমান করে নিতে হবে। পুকুরের পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে চারিদিকে এক ফুট উঁচু জাল দিয়ে এমনভাবে ঘিরে দিতে হবে যেন জালের নিচের প্রান্ত পাড়ের মাটিতে গ্রোথিত থাকে। এর ফলে মৎস্যভূক প্রাণি যেমন-সাপ, গোসাপ প্রবেশ করতে পারবে না। আবার কই মাছ ও পুকুর থেকে পালাতে পারবে না।

চুন ও সার প্রয়োগ

পুকুরের পানিতে অনেক ধরনের ক্ষতিকর রোগ-জীবাণু থাকে। এসব জীবাণু ধ্বংস করতে এবং পানির গুণাগুণ ঠিক রাখতে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর এবং কই মাছের পোনা মজুদের ৭-৮ দিন আগে সার প্রয়োগ করতে হবে। পানির রং বুঝে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ উর্বর পুকুরে অনেক সময় চুন প্রয়োগের পর পানিতে প্রচুর ফাইটোপ্ল্যাংকটন জন্মে। সেক্ষেত্রে পুকুরে সার প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই। কই মাছ প্রকৃতিতে সাধারণত জুপ্ল্যাংকটন ও জলজ কীটপতঙ্গ খায়। জুপ্ল্যাংকটনের উৎপাদন নির্ভর করে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের প্রাচুর্যতার উপর। আর পুকুরে সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যই হলো ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উৎপাদন বাড়ানো। সাধারণত জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার সার পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। পুকুরে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে সাধারণত চাষের প্রথম এক মাসের পর আর সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ চাষের এ পর্যায়ে পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য এমনিতেই তৈরি হয় এবং পানির রং যথেষ্ট সবুজ হয়ে যায়। তবে পানিতে যথেষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে চাষ চলাকালীন সার দিতে হবে (সারনি ২)।

সারণি ২: সার প্রয়োগের মাত্রা

সারের নাম	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ
গোবর	৫-৭ কেজি
কম্পোষ্ট	৮-১০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০-২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম

(বি:দ্র: জুপ্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য জৈবসারের (গোবর, কম্পোষ্ট) মাত্রা কিছুটা বেশি। ইউরিয়ার অর্ধেক পরিমানে টিএসপি সার দিতে হয়।)

পোনা মজুদ

নির্ভরযোগ্য সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি থেকে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। ধানী পোনার ক্ষেত্রে ১৫-২০ দিন নার্সারি পুকুরে রেখে ৪-৬ সে.মি লম্বা হলে অথবা ওজন ৩-৪ গ্রাম হলে স্ত্রী পোনাগুলোকে আলাদা করে পুকুরে চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পুকুর ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে শতাংশ প্রতি ৫০০-১০০০টি সুস্থ-সবল পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পোনাকে অবশ্যই পুকুরের পানির সাথে কন্ডিশনিং করে তারপর ছাড়তে হবে। পোনা মজুদ করার উত্তম সময় হল সকাল বেলা।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

কই মাছের পুষ্টি চাহিদা বিশেষ করে আমিষের চাহিদা কার্পজাতীয় মাছের চেয়ে বেশি। কই মাছের পোনার আমিষের চাহিদা ৩০-৩৫% এবং চাষযোগ্য মাছের ক্ষেত্রে তা ৩০%। অধিক ঘনত্বে কই মাছ চাষে ভাল উৎপাদন পেতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। কই মাছের একটি আদর্শ খাবারে আমিষ ৩০-৩৫%, চর্বি ৪-৫%, শর্করা ৪%, ছাই (Ash) ১৪%, আঁশ (Fibre) ৫% ও জলীয় অংশ ১১% থাকা প্রয়োজন। ইদানিং বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির পিলেট খাদ্য (ডুবন্ত ও ভাসমান) কিনতে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির নির্দেশনাও মানা যেতে পারে। খামারে তৈরি ভিজা খাবারের পাশাপাশি বানিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত ভাসমান পিলেট খাবার কই মাছের পুকুরে প্রয়োগ করা সর্বোত্তম। নিচের সারণি অনুসরণ করে প্রতিদিনের খাদ্যকে দু'ভাগ করে সকাল ও বিকালে ২ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারণি ৩: কই মাছের খাদ্য প্রয়োগের তালিকা (প্রতি শতাংশে)

দিন	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)	প্রতিদিনের খাদ্য (গ্রাম)
১-৯	১	২০	৬০
১০-১৯	৪	১৫	১৬৮
২০-২৯	৭	১২	২৩৫
৩০-৩৯	১২	১০	৩৩৬
৪০-৪৯	২০	৮	৪৪৮
৫০-৫৯	২৮	৭	৫৪৮
৬০-৬৯	৩৮	৬	৬৩৮
৭০-৭৯	৫২	৫	৭২৮
৮০-৮৯	৬৫	৪.৫	৮১৯
৯০-৯৯	৮০	৪	৮৯৬
১০০-১১০	১০০	৩.৫	৯৮০

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে ৩-৪ মাসে কই মাছ গড়ে ৯০-১০০ গ্রাম (ভিয়েতনামী কই ২০০-৩০০ গ্রাম) হবে। এ সময় জাল টেনে বা পানি শুকিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা নিতে হবে। নিচের সারণিতে একর প্রতি কই মাছের উৎপাদন দেখানো হলো–

সারণি ৪ : একর প্রতি কই মাছের উৎপাদন-

মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ	মজুদ ঘনত্ব/একর	বিক্রিযোগ্য মাছের সংখ্যা/একর (২০% মৃত্যুহার ধরে)	উৎপাদন (মেট্রিকটন/একর)	
			গড় ওজন ৯০ গ্রাম ধরে	গড় ওজন ১০০ গ্রাম ধরে
৫০০	৫০,০০০	৪০,০০০	৩.৬	৪
১০০০	১,০০,০০০	৮০,০০০	৭.২	৮

বাজারজাতকরণের আগের দিন জাল টেনে মাছ ধরে ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে বাজারজাত করার সময় মাছের মৃত্যুহার কম হবে। মাছ ধরার পর পরিস্কার পানি দিয়ে মাছগুলো ধৌত করা শ্রেয়। এরপর প্লাষ্টিকের ড্রামে পরিমাণমত পানি নিয়ে জীবন্ত অবস্থায় কই মাছ বাজারজাত করা যেতে পারে। এতে করে ভালো দাম পাওয়া যায়।

কই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনাঃ

- পুকুর প্রস্তুতকরণের কাজটি যথাযথভাবে করতে হবে।
- সুস্থ সবল পোনা মজুদ করতে হবে।
- উৎপাদন উপকরণ ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
- পরিমিত পরিমানে সুষম খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতিমাসে অন্তত: একবার নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর ২০-৩০% পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে।

তাছাড়া কই মাছ পরিবহনের সময় আঘাত প্রাপ্ত হলে ক্ষত রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাব হলে টিমসেন প্রতি শতাংশ পুকুরে (১ মিটার গভীরতায়) ২.৬৫ গ্রাম হারে ব্যবহার করা যেতে পারে (ইউনিট-৪ এ ক্ষত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আছে)। পুকুরে জীবাণুনাশক হিসেবে অ্যাকুয়াম্যাজিক ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহার মাত্রা প্রতি একর পুকুরে ১ মিটার গভীরতার জন্য ৫ কেজি। তাছাড়া পোনা মজুদের পর ১০ গ্রাম/শতাংশ হারে কপার সালফেট ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী কই মাছ চাষ পদ্ধতি জ্ঞান লাভ করে প্রতিবেদন লিখবে

সারসংক্ষেপ

কই মাছ অতি পরিচিত মাছ। দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে বলে একে জিয়ল মাছ বলে। বর্তমানে থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত চাষযোগ্য থাই কই এর বানিজ্যিক প্রসার রেখেছে। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ৩-৪ মাসেই কই ৯০-১০০ গ্রাম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি জিয়ল মাছ?

(ক) রুই (খ) খাতলা

(গ) মৃগেল (ঘ) কই

২। কী কারনে কই মাছ পানি ছাড়াই দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে?

(ক) বেশ শক্ত গড়নের হওয়ার কারনে (খ) অতিরিক্ত শ্বাসন অঙ্গ থাকার কারনে

(গ) পাখনায় কাটা থাকার কারনে (ঘ) দেহে আঁইশ থাকার কারনে

৩। কই মাছ কত দিনে বাজারজাতকরনের উপযোগী হয়?

(ক) ৩-৪ মাস (খ) ৮-১০ মাস

(গ) ১১-১৪ মাস (ঘ) ১৫-২০ মাস

পাঠ-১.৬ পাঙ্গাস মাছের একক চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাঙ্গাস মাছের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- পাঙ্গাসের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পাঙ্গাস, সম্পূরক খাদ্য, তুঁতে

বাংলাদেশের নদ-নদীতে এক সময় প্রচুর দেশী পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) পাওয়া যেত। নদী থেকে মাছটির পোনা সংগ্রহ করে পুকুর দীঘিতে চাষের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সফলতা আসেনি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তিতে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে "থাই পাঙ্গাস" আমদানি করা হয়। ১৯৯৩ সালে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটে থাই পাঙ্গাসের পোনা উৎপাদনের সফলতার পর থেকে এর চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

থাই পাঙ্গাস চাষের সুবিধা

(১) সব ধরনের জলাশয়ে চাষযোগ্য।
(২) চাষের জন্য পোনা পাওয়া যায়।
(৩) দ্রুত বর্ধনশীল।
(৪) একক ও মিশ্র প্রজাতির সাথে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়।
(৫) সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে।
(৬) পরিবেশের প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে।
(৭) দাম কিছুটা কম হলেও বাজার চাহিদা ভাল।
(৮) জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।
(৯) বিদেশেও রপ্তানিযোগ্য।

চিত্র ১.৬.১: থাই পাঙ্গাস

থাই পাঙ্গাসের একক চাষ

জলাশয় বা পুকুরে শুধু একটি প্রজাতি অর্থাৎ শুধু থাই পাঙ্গাস চাষ করলে তাকে থাই পাঙ্গাসের একক চাষ বলা হয়। এ ধরনের চাষ মূলত নিবিড় ব্যবস্থাপনায় করা হয়। থাই পাঙ্গাস মাছের একক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

পুকুর নির্বাচন

বন্যামুক্ত আলো-বাতাস পূর্ণ এলাকায় পুকুর নির্বাচন করতে হবে। এঁটেল দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটির পুকুর পাঙ্গাস চাষের জন্য উত্তম। পুকুর আয়তাকার হলে ব্যবস্থাপনা করতে সুবিধা হয়। পুকুরের আয়তন হতে হবে ২৫-১০০ শতাংশ এবং গভীরতা হবে ১.৫-২ মিটার। পুকুরের তলায় কাদার পরিমান ১৫ সে.মি এর বেশি না থাকাই ভাল।

পুকুর প্রস্তুতকরণ

জলজ আগাছা দমন, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণি দমন এবং পাড় ও তলা মেরামত করার পর যথাক্রমে চুন ও সার প্রয়োগ করে চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করতে হয়। উক্ত কাজগুলো যথারীতি আগের মতই করতে হবে (কই চাষের পুকুর প্রস্তুতকরণ অংশ দেখে নিতে পারেন)। চুন ও সার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কই মাছের একই মাত্রা প্রযোজ্য। তবে অধিক ঘনত্বে পাঙ্গাস চাষ করলে পুকুরে জৈব সার প্রয়োগ না করাই উত্তম। কারণ পাঙ্গাস চাষে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করা হয় তাতে পাঙ্গাসের মল-মূত্রের কারণে পরিবেশ এমনিতেই উর্বর থাকে এবং পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মে। অনেক সময় প্রাকৃতিক খাদ্যাধিক্যের ফলে মাছের সমস্যা দেখা দেয়। যে সব খামারি ভাসমান খাদ্য দিয়ে অধিক ঘনত্বে পাঙ্গাস চাষ করবেন তাদের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা উচিত।

পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির কাজ চলাকালীন ভাল পোনার জন্য নির্ভরযোগ্য নার্সারি/হ্যাচারি মালিকের সাথে যোগাযোগ শুরু করা বাঞ্চনীয়। ভাল ব্যবস্থাপনা আর ভাল খাবার খাওয়ালেই যে মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে তা অনেক সময় ঠিক নাও হতে পারে। ভাল উৎপাদন পাওয়ার পূর্বশর্ত হল ভালো মানসম্মত পোনা। অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding) জনিত সমস্যার কারণে সব হ্যাচারির পোনার মান সমান নয়। ভাল ও বিশ্বস্ত হ্যাচারির পোনা দেখে কিনতে হবে। পুকুরে মজুদ করার জন্য একটু বড় মাপের পোনা (৬-৭ ইঞ্চি লম্বা) হলে ভাল হয়। অনেকে অধিক ফলন পেতে আরো বড় আকারের পোনা (১০০-১৫০ গ্রাম ওজন/ প্রতিটি) মজুদ করে। সকালের কম তাপমাত্রায় পুকুরে পোনা মজুদ করতে হবে। পোনাকে অবশ্যই পুকুরের পানির সাথে কন্ডিশনিং (অভ্যস্তকরণ) করে তারপর ছাড়তে হবে। নিম্নের সারণি অনুসারে পোনার সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সারণি ৫ : পাঙ্গাসের পোনার মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

চাষ পদ্ধতি	উন্নত সনাতন পদ্ধতি	আধা-নিবিড় পদ্ধতি	নিবিড় পদ্ধতি
একক চাষ	১০০-১৫০ টি	১৫০-২০০টি	২৫০<

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পাঙ্গাসের একক চাষ মূলত: সম্পূর্ণভাবে সম্পূরক খাদ্য নির্ভর। তাই পাঙ্গাসকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হবে। খাদ্য প্রয়োগে ব্যাঘাত ঘটলে উৎপাদনে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পাঙ্গাসের খাবারে ২৫-৩০% আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়। ইদানিং বাজারে বিভিন্ন ধরনের (ভাসমান, ডুবন্ত ইত্যাদি) পিলেট খাদ্য বিক্রি হয়। তবে এসব খাদ্যের আমিষের মাত্রা জেনে তারপার কেনা উচিত। তাছাড়া খৈল, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, ফিসমিল, ময়দা/আটা, ভিটামিন প্রিমিক্স ইত্যাদি সমন্বয়ে ৩০% আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খামারেই তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাদ্যের খরচ কিছুটা কমে যায়। এ ধরনের খাদ্যকে "Farm-made moist feed" বলা হয়। নিম্নোক্ত হারে উপাদানগুলো ব্যবহার করে সহজেই ৩০% আমিষ নিশ্চিত করা যাবে-

সারণি ৬ : পাঙ্গাসের তৈরি খাদ্যে ব্যবহৃত উপাদানের শতকরা হার–

উপাদানের নাম	শতকরা হার
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩৫%
খৈল	৪৫%
ফিশমিল	৫%
ফিস কনসেনট্রেট	১০%
আটা/ময়দা	৫%
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.১%
	মোট = ১০০%

(বি:দ্র: উপাদানগুলোর ব্যবহার মাত্রা যৎসামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে। তবে বেশি পরিমাণ হেরফের করলে কাঙ্খিত আমিষ নিশ্চিত করা যাবে না।)

মাছের দেহের ওজনের ৩-৮% হারে খাবার দিতে হবে। চাষের শুরুতে মজুদকৃত পোনার জন্য বেশি হারে খাবার দিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে ওজন বাড়ার সাথে সাথে তা হ্রাস করতে হবে। সারণিতে বর্ণিত নিয়মে খাদ্য দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

সারণি ৭ : পাঙ্গাস মাছের গড় ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারের সম্পর্ক।

গড় ওজন	খাদ্য প্রয়োগের হার
১০০ গ্রাম	৫-৬%
১০১-২০০ গ্রাম	৫-৬%
২০১ গ্রামের উর্ধ্বে	৩-৫%

দিনে দুই বার খাবার দিতে হবে। পিলেট খাদ্য পুকুরের বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে। খামারে তৈরি ভিজা খাদ্য পুকুরে স্থাপিত ট্রে-তে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ :

পাঙ্গাসের ওজন ৫০০ গ্রামের ওপর হলে আহরণ করে বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে। বেড় জাল, ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে অথবা পুকুর শুকিয়ে সমস্ত মাছ একবারে আহরণ করা যেতে পারে।

পাঙ্গাসের মাছের রোগ ব্যবস্থাপনাঃ

পাঙ্গাস বেশ শক্ত প্রকৃতির মাছ। তারপরও পাঙ্গাসের রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে। রোগ হওয়ার আগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই উত্তম। সেক্ষেত্রে- পুকুর প্রস্তুতকরণ ধাপটি যথাযথভাবে করতে হবে। সুস্থ-সবল রোগমুক্ত পোনা মজুদ করতে হবে। সাধারণত নিম্নমানের চাষ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ধকলের (stress) কারণে পাঙ্গাস মাছ প্রোটোজোয়া ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। এসব ব্যাকটোরিয়াজনিত রোগের চিকিৎসায় তুঁত ব্যবহার বেশ ফলদায়ক BKC (Benzal Konium Chloride) দ্রবণে ৭-১০ দিন আক্রান্ত মাছকে গোসল করালেও প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক যেমন- টেট্রাসাইক্লিন (মাত্রা ৫৫-৭৭ মিগ্রা/কেজি খাবার) খাবারের সাথে মিশিয়ে ৭-১০ দিন আক্রান্ত মাছকে খাওয়ালে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাঙ্গাস মাছের খামার পরিদর্শন করে মাছটি বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রতিবেদন তেরি করুন।

সারসংক্ষেপ

পাঙ্গাস মাছ দামে সস্তা হওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। নদ-নদীতে দেশী পাঙ্গাস খুব একটা পাওয়া যায় না। আধুনা বাংলাদেশে থাই পাঙ্গাসের চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। স্থানীয়ভাবে হ্যাচারিতে গুলোতে থাই পাঙ্গাসের পোনার সহজ প্রাপ্যতা এর একটি কারন। মাছটি বেশ শক্ত প্রকৃতির হওয়ায় রোগ-বালাই খুব একটা হয় না। পাঙ্গাস চাষ করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেশি পাঙ্গাসের বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?

(ক) *Pangasius sutchi* (খ) *Pangasius pangasius*
(গ) *Plotosus canius* (ঘ) *Wallago attu*

২। বাংলাদেশে কত সালে থাই পাঙ্গাস মাছ আমদানি করা হয়?

(ক) ১৯৮৫ সাল (খ) ১৯৯০ সাল
(গ) ১৯৯৫ সাল (ঘ) ২০০০ সাল

পাঠ-১.৭ ব্যবহারিক : প্রদর্শিত মাছ (রাজপুঁটি, নাইলোটিকা কই ও পাঙ্গাস) শনাক্তকরণ।

মূলতত্ত্ব : মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্য। আমাদের দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা মেটাতে মাছের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে মাছ শনাক্ত করতে পারে সে দিকে বিবেচনায় রেখেই এই পাঠের অবতরণা।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

i. নমুনা মাছ (রাজপুঁটি, নাইলোটিকা কই ও পাঙ্গাস)
ii.. মাছ রাখার জন্য ট্রে/পাত্র
iii. ফরসেফ বা চিমটা
iv. ফরমালিন
v. খাতা, কলম ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতিঃ

i. প্রথমে বাজার থেকে চারটি নমুনা মাছ জোগাড় করুন।
ii.. এবার চারটি মাছকে পৃথক পৃথক ট্রেতে রাখুন।
iii. মাছগুলো যাতে তাড়াতাড়ি পচে না যায় তার জন্য সামান্য পরিমাণ ফরমালিন ব্যবহার করুন।
iv. এবার চিমটা দিয়ে নমুনা মাছগুলো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করুন।
v. ব্যবহারিক নোটবুকে ট্রেতে রাখা মাছ চারটির চিহ্নিত চিত্র অংকন করুন এবং তাদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখুন।
vi. ক্লাস শেষে মাছগুলো গ্লাসজারে ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ করুন।

নমুনা-কঃ রাজপুঁটি
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

i. রূপালি আঁইশে আবৃত দেহ দেখতে অনেকটা দেশী সরপুঁটির মত। তবে শরীর পার্শ্বীয়ভাবে বেশ চ্যাপ্টা ও পাতলা।
ii. দেশী সরপুঁটি তুলনায় এর মাথা ছোট।
iii. দেহের সামনে ও পিছনে চাপা এবং মাঝখানে বেশ চওড়া।
iv. মাছটির পিঠের দিকে হালকা মেটে এবং পেটের পাখনার রং হালকা হলুদ।

নমুনা–খ : নাইলোটিকা
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

i. মাছটি দেখতে ধুসর-নীলাভ থেকে সাদা লালচে।
ii. পৃষ্ঠ পাখনা কালো বর্ণের মার্জিনযুক্ত এবং পুচ্ছ পাখনা সাদা বর্ণের সরু ও লম্বা দাগযুক্ত ।
iii. পৃষ্ঠ ও পায়ু পাখনায় শক্ত কাঁটা আছে।

নমুনা–গ : কই
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

i. দেশী কই-মাছ ছোট অবস্থায় কালচে ধরনের এবং পরিপক্ক অবস্থায় পিঠের দিকে বাদামী সবুজ আর পেটের দিকে হালকা হলুদ রঙের হয়। থাই/ভিয়েতনামী কই-এর দেহ হালকা ফ্যাকাশে ধরনের। দেহের উপরিভাগে ছোট ছোট কালো দাগ থাকে এবং পাখনাগুলো হালকা হলুদ রঙের হয়।
ii. দেশী কই-এর কানকোর পিছনে কালো দাগ থাকে কিন্তু পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে না। থাই কইয়ের কানকোর পিছনে এবং পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে।
iii. দেশী কই-এর মুখ কিছুটা চোখা (Pointed) এবং থাই কই এর মুখটা ভোঁতা (Blunt)।
iv. উভয়েরই পৃষ্ঠ পাখনায় ১৬ থেকে ২০টি এবং পায়ু পাখনায় ৯-১১ টি শক্ত কাঁটা থাকে।
v. মাথার উপরেও আঁইশ বিদ্যমান।

নমুনা–ঘ : পাঙ্গাস (থাই)
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

i. পাঙ্গাসের দেহে কোন আঁইশ থাকে না।
ii. পাঙ্গাস দেখতে রুপালি-সাদা, পিঠের দিকটা নীলাভ-কালচে বর্ণের হয়।
iii. পিঠে ৯টি ও কানের পাশে ২টি শক্ত কাঁটা থাকে।
iv. এদের ছোট গোঁফ এবং পিঠে এডিপোজ ফিন (Adipose fin) থাকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সিরাজুল একজন প্রান্তিক চাষী। তার একটি পুকুর আছে। তিনি তার পুকুরে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নিলেন। মাছ চাষ বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষন নিয়ে তিনি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করলেন।
ক) মাছ বলতে কী বোঝায়?
খ) বাংলাদেশে মাছের চাষ বৃদ্ধি পাবার কারন বর্ননা করুন।
গ) পুকুরে মাছ চাষ করে লাভবান হতে কী করণীয়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) বাংলাদেশে মাছ চাষের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। প্রতি বৎসর সাজু তার এক একরের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়েন। এতদিন মাছ চাষে তার কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এবার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসারে তিনি ভালভাবে পুকুর প্রস্তুত করে বাণিজ্যিকভাবে থাই পাঙ্গাসের চাষ শুরু করতে আগ্রহী হয়েছেন।
ক) একক চাষ কী?
খ) আমাদের দেশে কোন ধরনের মাছ চাষ পদ্ধতি বেশি জনপ্রিয়? ব্যাখ্যা করুন।
গ) বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষে কীভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হয় তা বর্ণনা করুন।
ঘ) বাংলাদেশে ইদানিং অনেকেই মাছ চাষের দিকে ঝুঁকছে কেন? যুক্তিসহ মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ ঃ ১। খ ২। খ